UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ

DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-২০১০ January-February 2010

২২তম বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা Volume-XXII, No. 1 & 2

ছয় হাজার ভাষা : ঐতিহ্য টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত

প্রতি বছর দশটি ভাষার বিলুপ্তি ঘটে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এই ধস মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

নিকট ভবিষ্যতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষার বিলুপ্তি কি নিয়তি নির্ধারিত? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে ভাষায় ১ লাখ লোক কথা বলেনা তা টিকে থাকতে পারে না। বিশ্বের ৬ হাজার বা অনুরূপ সংখ্যক ভাষার অর্ধেকে ১০ হাজারের কম লোক কথা বলে এবং এক-চতুর্থাংশ ভাষায় কথা বলে ১ হাজারের কম লোক। মাত্র এক কুড়ি ভাষায় কথা বলে কোটি কোটি লোক।

ভাষার বিলুপ্তি নতুন কোনো ব্যাপার নয়। ভাষাবৈচিত্র্য বড় চমকপ্রদ। অন্তত ৩০ হাজার (কারো কারো মতে ৫ লাখ) ভাষার জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই কোনো চিহ্ন পর্যন্ত না রেখে। ভাষার আয়ুষ্কাল অপেক্ষাকৃত কম এবং বিলুপ্তির হার অনেক বেশি। বাস্ক, মিসরীয়, চীনা, গ্রিক, হিরক, ল্যাটিন, ফার্সি, সংস্কৃত ও তামিলের মতো গুটি কয়েক ভাষা ২ হাজার বছরের বেশি টিকে আছে।

সংখ্যালঘু ভাষার পার্শ্ব অবস্থান

তবে, নতুন বিষয় হলো ভাষা বিলুপ্তির গতি। ইউরোপের ঔপনিবেশিক বিজয় ভাষাবৈচিত্র্যের দ্রুত অবনতি ঘটায়। সে সময়ে লোকে যত ভাষায় কথা বলতো তার শতকরা অন্তত ১৫ ভাগের বিলুপ্তি ঘটেছে। বিগত ৩শ' বছরে ইউরোপ অন্তত এক ডজন ভাষা হারিয়েছে এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে যে ২৫০টি ভাষায় লোকে কথা বলতো তার মাত্র ২০টি টিকে আছে। ব্রাজিলে ১৫৩০ সালে পর্তুগিজ উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে প্রায় ৫৪০টি ভাষা (মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ) হারিয়ে গেছে।

ভাষার সমজাতীয়তার সঙ্গে ভূখন্ডগত সম্পর্কের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ও জাতীয় ভাষা নির্বাচন ও সংহতকরণ এবং অন্যান্য ভাষাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষা, প্রচার মাধ্যম ও সরকারি কাজে একটি

দাপ্তরিক ভাষা প্রতিষ্ঠায় বিপুল প্রয়াসের মাধ্যমে জাতীয় সরকারগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে সংখ্যালঘু ভাষাগুলোকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছে।

শিল্পায়ন ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে ভাষা প্রণিতকরণের প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে যা দ্রুমত, বাহুল্যবর্জিত ও বাস্তবে কার্যকর যোগাযোগের নতুন নতুন পদ্ধতি আরোপ করেছে। ভাষাবৈচিত্র্যকে বাণিজ্য ও জ্ঞানের প্রসারের একটা বাধা হিসেবে দেখা শুরম্ন হয়। এক ভাষাবাদ আদর্শ হিসেবে দেখা দেয়া এবং উনবিংশ শতকের শেষ দিকে একটি বিশ্বজনীন ভাষার ধারণা জন্ম নেয় এবং ল্যাটিন ভাষায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়ও বিবেচিত হয়–যা কৃত্রিম ভাষার একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে, এমন একটি ভাষা হলো ভলাপুক। সবচেয়ে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও দীর্ঘতম স্থায়িত্ব পেয়েছে এসপেরানটো। ভাষা আরো সম্প্রতি, আর্থিক বাজারের আন্তর্জাতিকায়ন, ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে তথ্যের প্রসার ও বিশ্বায়নের অন্যান্য বিষয় 'ছোট ছোট' ভাষার প্রতি হুমকি জোরদার করেছে। আধুনিক বিশ্বে যে ভাষা ইন্টারনেটে নেই তার 'কোনো অস্তিত্ব নেই'। এই ভাষার খেলা শেষ। ব্যবসা–বাণিজ্যে এ ভাষার কোনো ব্যবহার নেই।

বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ১০টি করে ভাষা বিলুপ্তির হার নজিরবিহীন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কেউ কেউ পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, আজকে লোকে যেসব ভাষায় কথা বলে তার শতকরা ৫০ থেকে ৯০ ভাগ চলতি শতাব্দীতেই হারিয়ে যাবে। এসব ভাষা সংরক্ষণের বিষয়টি জরম্নরি।

ভাষা বিলুপ্তির পরিণতি কয়েকটি কারণে গুরম্নত্বপূর্ণ। সর্বাগ্রে, আমরা সবাই যদি একই ভাষায় কথা বলা ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের মস্তিষ্ক সম্ভবত ভাষা বিষয়ক স্বাভাবিক কিছু উদ্ভাবনী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। আমরা কোনোদিনই মানুষের ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো কূল–কিনারা পাব না বা 'প্রথম ভাষার' রহস্যও সমাধান করতে পারব না। একটি ভাষার বিলুপ্তির সঙ্গে মানব ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

বহু ভাষাবাদ বহু সাংস্কৃতিকবাদের সবচেয়ে নিখুঁত প্রতিফলন। প্রথমটির ধ্বংস ও জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো ভাষা চাপিয়ে দেয়া হলে তা তাদের সম্মিলিত পতিভার বহিঃপ্রকাশকে রুদ্ধ করে দেয়। ভাষা কেবল মানুষের যোগাযোগের প্রধান হাতিয়ারই নয়, বরং যারা সে ভাষায় কথা বলে তা তাদের বিশ্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের কল্পনা ও তাদের জ্ঞান কাজে লাগানোর উপায় ব্যক্ত করে।

প্রথাগত সংস্কৃতির মৃত্যুকালীন ফিসফিসে ধ্বনি

প্রতিটি ভাষা বিশ্বকে কেমন ভিন্নভাবে প্রতিফলিত করে তা বুঝার জন্য প্রতিটি ভাষার একই অর্থনৈতিক শব্দগুলোর তালিকা করতে হবে। যেমন আমি, তুমি, আমাদের, কে, কি, না, সবাই, এক, দুই, বড়, লম্বা, ছোট, নারী, পুরুষ, খাওয়া, দেখা, শোনা, সূর্য, চাঁদ, তারকা, পানি, আগুন, গরম, ঠান্ডা, সাদা, কালো, রাত, জমি। খুব বেশি হলে এমন প্রায় ৩শ শব্দ রয়েছে।

বহু ভাষাবাদের প্রতি হুমকি জৈব বৈচিত্রের প্রতি হুমকির মতো কেবল যে বেশিরভাগ ভাষাই অবলুপ্তপ্রায়' 'প্রজাতি' মতো, তা নয়, বরং জৈববৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা নৈমিত্তিক সম্পর্ক রয়েছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির মতো বিপন্ন ভাষাগুলো ছোট ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। যেসব দেশে বিপুল জৈববৈচিত্র্য রয়েছে তার শতকরা ৮০টি বেশি দেশে স্থানীয় ভাষার সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি। এর কারণ হলো, লোকে যখন তাদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয় তখন সে সম্পর্কে তারা একটা বিশেষ জ্ঞানভান্ডার গড়ে তোলে, যার প্রতিফলন ঘটে তাদের ভাষা এবং কেবল সেখানেই তা থেকে বিশ্বের অনেক বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির কথা কেবল বিশেষ কিছু লোকই জানে, যাদের ভাষা বিলুপ্তপ্রায়। তারা মারা গেলে, পরিবেশ সম্পর্কে প্রথাগত সকল জ্ঞান তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

১৯৯২ সালে রিও ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলন সংকোচনশীল জৈববৈচিত্র্য মোকাবেলায় ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এখন ভাষার বিলুপ্তি ঠেকানোর জন্য একটি রিও শীর্ষ সম্মেলনের সময় উপস্থিত হয়েছে। বিশ শতকের মধ্যভাগে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদে ভাষার অধিকার যখন অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল (ধারা–২) তখনই ভাষা রক্ষার প্রয়োজন নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এরপর মানবজাতির উত্তরাধিকার হিসেবে এখন যা বিবেচিত তা রক্ষা করার জন্য বেশ কয়েকটি চুক্তি ও প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এসব আইন ও উদ্যোগ হয়তো ভাষার বিলুপ্তি রোধ করতে পারবে না, কিন্তু অন্তত সেই প্রক্রিয়াকে মন্থর ও বহু ভাষাবাদকে উৎসাহিত করবে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভাষার চেয়ে আর কোনো কিছুই আমাদের আত্মায় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভাষা আমাদের ভাবনাকে মুক্ত করে, আমাদের মন বিকশিত করে এবং জীবন করে কোমল।

সুইডেনের সামি ভাষায় রচিত কবিতা থেকে উদ্ধৃত

লেখক
রানকা বজেল জ্যাক বাবিক
ফ্রান্সের পইটিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষার মনস্তত্ত্বের প্রভাষক ও বিশেষজ্ঞ

জাপারোর হারিয়ে যাওয়া গোপন জ্ঞান

ইকুয়েডরীয় আমাজনে বসবাসরত একশ' বা অনুরূপ সংখ্যক জাপারো ইন্ডিয়ান তাদের ভাষা, ভূমি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সময়ের বিরুদ্ধে পালস্না দিয়ে ছুটে চলেছে

'আমার নাম মানারি। আমার জাপারো ভাষায় এর অর্থ বনের তাগড়া টিকটিকি। কিন্তু দাপ্তরিক প্রয়োজনে আমরা আমাদের নাম নিবন্ধন করতে চাইলে তা সেখানে স্পেনীয় নাম ব্যবহার করতে হবে। তাই আমাকে বারটোলো উশিগুয়া নামেও ডাকা হয়। জাপারো আমাজনের সবচেয়ে বড় ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীগুলোর ব্যবহৃত ভাষার অন্যতম। আমাদের শামানরা অত্যন্ত শক্তিধর ছিলেন, কারণ তারা ৫শ'র বেশি উদ্ভিদের ভেষজ রহস্য জানতেন।[১]

পঁচিশ বছর বয়স্ক মানারি সর্বশেষ শামানের ছেলে। তিনি তিন বছর আগে মারা যান। কুইটোর ২৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে কোনামবো নদীর তীরে আমাজনের পাসতাজা প্রদেশে বসবাসরত ১১৫ জন জাপারোর তিনি প্রধান। এই নদী তাদের সব দুর্ভাগ্যের কারণ– দুর্ভাগ্য ত্বরান্বিত করেছে জাপারোর পতন–এসেছে বসতি স্থাপনকারী, রোগব্যাধি, রাবার চাষের ধুম, দাসত্ব, যুদ্ধ, তেল অনুসন্ধান ও 'আধুনিক বিশ্ব'।

ইকুয়েডরীয় ভাষাবিদ ও সাংবাদিক মানারি বলেন, 'শ্বেতাঙ্গ রাবার বণিকরা আমাদের জঙ্গলে এসে দাস হিসেবে কাজে খাটানো এবং অস্থাবর সম্পত্তির মতো বিক্রি করার জন্য আমাদের লোকজনকে ধরে ধরে নিয়ে যায়। তারা এমন সব রোগব্যাধি সঙ্গে নিয়ে আসে যা আমাদের শামানরা সারিয়ে তোলার উপায় জানতেন না। তাই আমাদের অধিকাংশ লোক মারা যায়।'

'এ দেশে জাপারোরা সরকারিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রায় ১০ বছর আগে ইকুয়েডরে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এ কথা বলা হয়েছে। আজকে তারা বাঁচার জন্য এখনো লড়াই করছে, যদিও হুমকির সংখ্যা যে কত তা তারা গুণে শেষ করতে পারে না– তাদের ভাষায়, এ সংখ্যা মাত্র তিনটি।

তরুণ জাপারোরা গত তিন বছর ধরে মানারির নেতৃত্ব এবং পাসতাজা আদিবাসী জনসংগঠনের (ওপিআইপি) সমর্থনে শিকারি ও সংগ্রহকারী হিসেবে তাদের সংস্কৃতি ও প্রথাগত জীবনধারা রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি : জাপারো ভাষা বাঁচিয়ে রাখা, জাপারো ভূখন্ড স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা ও সীমান্তের ওপারে পেরুতে বসবাসরত জাপারোদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করা। এ যাবৎ যে ফল পাওয়া গেছে তা উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

শেষ শামান

পেরুর অধিবাসী স্বজনদের সঙ্গে তারা মিলিত হতে পারছে না। প্রায় ৬০ বছর আগে ইকুয়েডর ও পেরুর মধ্যে এক যুদ্ধের পর তাদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। নদীর পানি যখন কম থাকে সেখানে যেতে

১. মানারির কথাগুলো পেরুতে ইকুয়েডরীয় দূতাবাসের সাংস্কৃতিক অ্যাটাশেকে দু'বছর আগে লিখিত একটি চিঠি থেকে নেয়া হয়েছে। চিঠিতে ইকুয়েডরীয় জাপারোদের সীমান্ত অতিক্রম করে পেরুর জাপারোদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগদানের অনুরোধ জানানো হয়।

তাদের এক মাস সময় লাগে, আর নদী ভরা থাকলে সময় লাগে তিন মাস। মাত্র কয়েক মাস আগে কেউ একজন জাপারোদের একটি ছোট মোটর নৌযান দিয়েছে। ইকুয়েডরীয় জাপারোদের বিরোধপূর্ণ ভূখন্ডে যাওয়ার সুবিধার্থে কূটনৈতিক যোগাযোগও চালাতে হবে।

মানারি বলেন : 'আমরা ইকুয়েডরীয়। কিন্তু এক সময়ে জাপারোরা একটি একক জনগোষ্ঠী ছিল এবং এমনভাবে একটি জঙ্গালে বাস করতো। তাই সীমান্ত অতিক্রম বা আমাদের লোকজনকে খোঁজাখুঁজি করার জন্য আমাদের অনুমতি নিতে হতো না।'

ইতোমধ্যেই বাছাই করা চার সন্তানের একটি গ্রুপের জন্য এই পরিকল্পনা। এই গ্রুপ পেরুতে বসবাসরত শামানদের কাছে যাবে এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, যারা তাদের পদ্ধতিগুলো শিখিয়ে দেবেন। সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিন বছর আগে শেষ শামান মারা যাওয়ার পর জাপারোরা তাদের প্রথা-ঐতিহ্য, উদ্ভিদের নিরাময় ক্ষমতা ও জঙ্গালের গোপন বিষয়গুলো সম্পর্কিত জ্ঞানের একমাত্র উৎস হারিয়ে ফেলে। মানারি বলেন, 'আমার বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের দেখার মতো আর কেউ নেই এবং অনেক লোক অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে।'

প্রথাগত জ্ঞান ও শামানদের রোগ নিরাময় তত্ত্ব কেবল ভাষার মাধ্যমেই উত্তরসুরিদের জন্য রেখে যাওয়া সম্ভব। জাপারো ভাষা সংরক্ষণ করা সাংস্কৃতিক বিষয়ের চেয়ে বেশি। সম্প্রদায়ের ভৌত অস্তিত্বই বিপন্ন। আর এটাকে বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা সময়ের বিরুদ্ধে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। কারণ মাত্র পাঁচজন অতি বয়োবৃদ্ধ এখনো জাপারো ভাষায় কথা বলেন এবং তারা একজন আরেকজনের কাছ থেকে কয়েকদিনের পথের দুরত্বে থাকেন। এদের একজন হলেন সামিকো টাকিয়াউরি। প্রায় ৭০ বছর আগে কোনামবো নদীর তীরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'সে সময় সবাই জাপারো ভাষায় কথা বলতো। ১৮ বছর বয়সের আগে আমি কোয়েচুয়া শিখিনি।'

জাপারোর কাহিনী ইকুয়েডরীয়-পেরুভিয়ান অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসী ভাষার মতোই। আরাবেলা, ইকুইটো ও টাউনসনিরোর সঙ্গে মিলে জাপারো ভাষা গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিলুপ্ত কোনামবো, গায়ে ও আনডায়ার সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি কোয়েচুয়ার জন্য জাপারো পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সাসিনোর মতে, প্রায় ৬০ বছর আগে কোয়েচুয়াদের সারায়াকু গ্রামের সঙ্গে বাণিজ্য করতে গিয়ে জাপারোরা কোয়েরা ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মিল দেখতে শুরু করে।

এখন জাপারোদের গ্রাম ললানচামা, কোচা, জান্ডিয়া ইয়াকু ও মাজারামুতে বসবাসরত সাসিকোর পৌত্র-প্রপৌত্রদের সরকারের ফরমান অনুসারে দ্বিভাষিক পাঠ্যক্রমের আওতায় কোয়েচুয়া ও স্পেনীয় ভাষা শেখানো হয়। শিক্ষকরা মাধ্যমিক স্কুলের স্নাতক। যেসব গ্রামে তারা শিক্ষাদান করেন তাদের জন্ম সেসব গ্রামে নয়। তাদের মাসে ৪ ডলার করে দেয়া হয়। তারা খোলাখুলিভাবেই বলেন যে, যত তাড়াতাড়ি পারেন এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবেন। তাদের অধিকাংশ ছাত্রই স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে না এবং কোয়েচুয়া শেখে তারা পুরোপুরি মৌখিকভাবে।

মানারি বলেন, 'সাহায্য চাইতে আমরা পছন্দ করি না। কিন্তু যেহেতু আমাদের অল্প কয়েকজন মাত্র বেঁচে আছে, তাই ভয় হয় যে, পথের শেষ এটাই।' জাপারোরা যে মরে শেষ হয়ে যায়নি তা বিশ্বকে দেখানোর জন্য সাসিকোর নেতৃত্বে প্রবীণরা ইতোমধ্যে আবারো নিজেদের মাতৃভাষায় শিশুদের নাম রাখতে শুরু করেছে। আর এসব নাম হলো নেওয়া, টোয়ারা, মুকুটজাগুয়া (তোতা, তিতির ও ওরিয়াল পাখি)।

আমার ভাষা, আমার মূল্যবান স্বত্ব
আমার ভাষা আমার মমতার ধন
আমার ভাষা আমার মূল্যবান অলঙ্কার
নিউজিল্যান্ডের একটি মাওরি পোস্টার থেকে

বিজয়ী এবং পরাজিতরা

বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক লোক তাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বমোট আটটি ভাষায় কথা বলে। আর কেবল নিউগিনির লোকেরাই বিশ্বের এক-ষষ্ঠাংশ ভাষায় কথা বলে

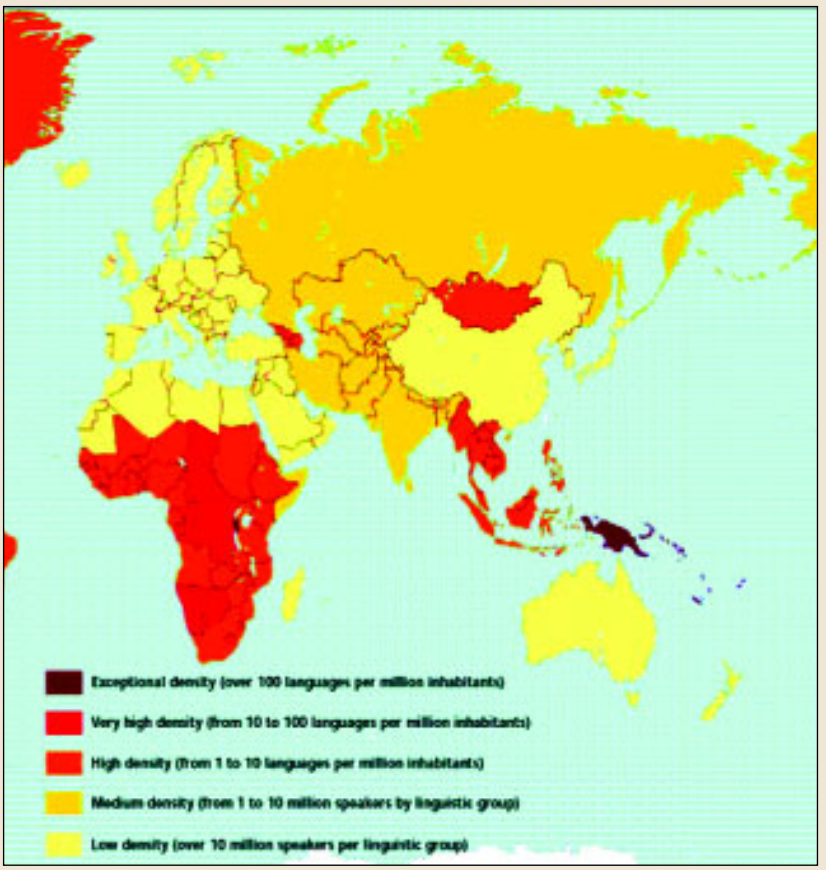

ভাষাগত উত্তরাধিকারের বিস্তরণ অত্যন্ত অসম। লোকে সবচেয়ে কম জানে এমন মাতৃভাষা সংরক্ষণের প্রচারণায় নিয়োজিত সামার ইনস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকসের (এসআইএল) হিসেবে বিশ্বের ৬ হাজার ভাষার মধ্যে শতকরা মাত্র তিনভাগ ইউরোপে ব্যবহৃত হয়। ৬ হাজার ভাষার অর্ধেক ব্যবহৃত হয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এর মধ্যে শীর্ষে আছে নিউগিনি (ইন্দোনেশিয়ার ভূখন্ড ইরিয়ান জায়া ও পাপুয়া নিউগিনি)। সেখানকার লোকে বিশ্বের এক-ষষ্ঠাংশ ভাষায় কথা বলে।

ভাষাবৈচিত্র্য জনসংখ্যার ঘনত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় : বিশ্বের শতকরা মাত্র চারভাগ লোক শতকরা ৯৬ ভাগ ভাষায় কথা বলে এবং শতকরা ৮০ ভাগের বেশি আঞ্চলিক, অর্থাৎ এক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি লোক মাত্র প্রায় ২০টি ভাষায় কথা বলে।

গণনার পদ্ধতির কারণে সংখ্যা তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও মিলেনিয়াম ফ্যামিলি এনসাইক্লোপিডিয়ার (ডরলিং কিনডারসলি, লন্ডন, ১৯৯৭) হিসেবে বিশ্বের অর্ধেক লোক দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীর সর্বাধিক ব্যাপক আটটি ভাষার একটিতে কথা বলে : চীনা (একশ' ২০ কোটি), ইংরেজি (৪৭ কোটি ৮০ লাখ), হিন্দি (৪৩ কোটি ৭০ লাখ), স্পেনীয় (৩৯ কোটি ২০ লাখ), রুশ (২৮ কোটি ৪০ লাখ), আরবি (২২ কোটি ৫০ লাখ), পর্তুগিজ (১৮ কোটি ৪০ লাখ) ও ফরাসি (১৮ কোটি ৫০ লাখ)। এসআইএল ও লিঙ্গুয়া স্কোয়ার অবজারভেটরি একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরছে যাতে সেসব ভাষাভাষীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা মাতৃভাষা হিসেবে একটি ভাষায় কথা বললেও তাদের জন্য তা 'দ্বিতীয় ভাষা'।

প্রতি বছর দশটি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে

এই অসমতা দৃষ্টে বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, অস্তিত্বমান সব ভাষার শতকরা ৯৫ ভাগ আগামী শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বর্তমানে কোনো না কোনো স্থানে প্রতি বছর ১০টি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ এমন দাবি করেন যে, প্রতি দু'সপ্তাহে একটি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে

ব্যবহারকারীর সংখ্যার হিসেবে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ভাষা*

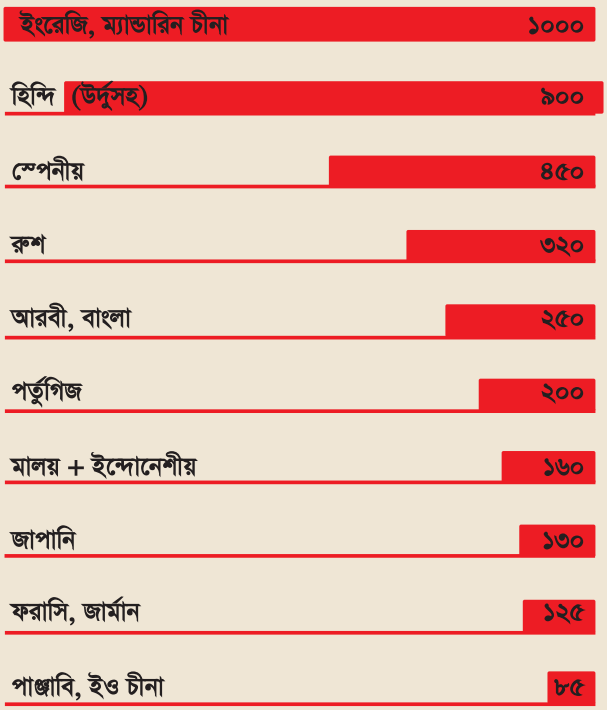

বিশ্বের ভাষাগুলোর ভৌগোলিক বিস্তরণ

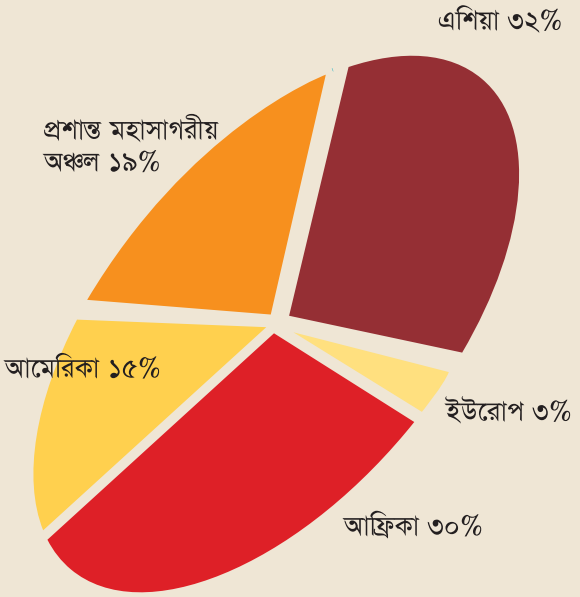

যায়। যেসব এলাকায় ভাষাবৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি, বিলুপ্তির হারও বিশেষ করে সেখানে বেশি।

আফ্রিকায় দুইশ'র বেশি ভাষার প্রতিটিতে কথা বলে ৫শ'র কম লোক, হয়তো সহসাই এগুলো হারিয়ে যেতে পারে। ভাষার অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য কমপক্ষে এক লাখ লোকের তাতে কথা বলা প্রয়োজন।

উত্তর আমেরিকায় সবচেয়ে বড় হুমকি রয়েছে আদিবাসী ও ক্রিওল ভাষাগুলোর প্রতি। ব্যতিক্রম হিসেবে নাভাজো, ক্রি ও ওজিবোয়াকে বাদ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এখন পর্যন্ত অ্যামেরিন্ডিয়ান মাতৃভাষা টিকে আছে বিপন্ন অবস্থায়।

লাতিন আমেরিকার ৫শ' অ্যামেরিন্ডিয়ান ভাষার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের মতো ভাষা বিপন্ন। এর মধ্যে বিলুপ্তির হার সবচেয়ে বেশি ব্রাজিলে, যেখানে বেশিরভাগ ভাষাই খুব ছোট ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত প্রতিটি ভাষায় অপেক্ষাকৃত বেশিসংখ্যক লোকে কথা বলে এবং ভবিষ্যতে ৬ থেকে ৭শ'র মধ্যে ৪০টি ভাষার ভবিষ্যৎ বহুলাংশে সরকারের নীতির ওপর নির্ভর করবে।

অপরদিকে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার ৪৭টি ভাষার মধ্যে রুশ ভাষার চাপের মুখে মাত্র ছয়টি ভাষার টিকে থাকার প্রকৃত সম্ভাবনা রয়েছে। ২০টি ভাষা 'বিলুপ্তির পর্যায়ে', আটটি 'মারাত্মক বিপন্ন' এবং ১৩টি 'বিপন্ন'। প্রথম গ্রুপের ভাষার প্রতিটিতে খুব বেশি হলে ডজন খানেক লোক কথা বলে। দ্বিতীয় গ্রুপের ভাষা আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও শিশুদের মধ্যে তার ব্যবহার ছড়াচ্ছে না। তৃতীয় গ্রুপের ভাষা কোনো কোনো শিশু ব্যবহার করলেও তাদের সংখ্যা খুব কম। এসব তথ্য জানিয়েছে ইউনেস্কোর প্রকাশিতব্য রেড বুক অন এনডেনজারড ল্যাঙ্গুয়েজেজ-ইউরোপ অ্যান্ড নর্থ-ইস্ট এশিয়া। ইউরোপে লোকে ১২৩টি ভাষায় কথা বলে। এর মধ্যে নয়টি বিলুপ্ত প্রায়, ২৬টি মারাত্মক বিপন্ন এবং ৩৮টি বিপন্ন বলে ইউনেস্কো পুস্তকে জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কো মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা'র বাণী

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

এখন থেকে দশ বছর ধরে আমরা ইউনেস্কো সদর দপ্তর ও সদস্য দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করছি। দশ বছর ধরে দিবসটি পালন উপলক্ষে অগণিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাষাবৈচিত্র্য ও বহু ভাষাবাদের গুরুত্ব এখন স্বীকৃত। বিগত বছরগুলোতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভাষা যে অনেক ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে তা ভালোভাবে অনুধাবনের অবস্থায় এসেছে।

যে ভাষায় প্রথম শব্দগুলো উচ্চারিত হয় এবং ব্যক্তিচিন্তার প্রকাশ ঘটে, সেই মাতৃভাষা হলো প্রত্যেক ব্যক্তির ইতিহাস ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ। অধিকন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, স্কুলের প্রথম বছরগুলোতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হলে শিশু সবচেয়ে ভালো শেখে।

মাতৃভাষার ধারণা বহু ভাষাবাদ সম্পর্কিত ধারণার পরিপূরক, যা ভাষার অন্তত তিনটি পর্যায়ে দক্ষতা অর্জনে উৎসাহদানের মাধ্যমে ইউনেস্কো এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে–যেগুলো হচ্ছে একটি মাতৃভাষা, একটি জাতীয় ভাষা ও একটি যোগাযোগের ভাষা।

একাদশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন বর্ষের কাঠামোর মধ্যে পড়ছে। ভাষা হলো পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতার সর্বোত্তম বাহন। সব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা কোনোরূপ বর্জন ব্যতীত সমাজ ও সমাজের সব সদস্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বহু ভাষাবাদ হলো একটি অভিন্ন স্থানে কথা বলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষার প্রীতিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান। তাই তা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতির অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়, যার প্রতি ক্রমবর্ধমান হারে মনোযোগ দিতে হবে।

একই সঙ্গে বিদেশি ভাষা শিক্ষা এবং এর ফলে কয়েকটি ভাষা ব্যবহারে ব্যক্তির সামর্থ্য, বৈচিত্র্য ও অন্যান্য সংস্কৃতি অনুধাবনের প্রতি উন্মুক্ততাকে উৎসাহিত করে। তাই আধুনিক শিক্ষার একটি গঠনমূলক ও কাঠামোগত উপাদান হিসেবে এটা এগিয়ে নিতে হবে।

আমাদের বিশ্বায়নকৃত বিশ্বে যোগাযোগের বর্ধিত গতির কারণে ভাষান্তর মানব ইতিহাসে প্রবৃদ্ধির এক নজিরবিহীন পর্যায় ভোগ করছে। পারস্পরিক সংলাপ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর একটি প্রকৃত হাতিয়ার হয়ে ওঠার জন্য আমাদের আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আরো বেশি ভারসাম্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিনিময় বৃদ্ধি করতে হবে।

বহু ভাষাবাদ, বিদেশি ভাষা শিক্ষা ও ভাষান্তর হলো আগামী দিনের ভাষানীতির তিনটি কৌশলগত হাতিয়ার। একাদশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এই তিনটি হাতিয়ারের প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাব নিয়ে মাতৃভাষাকে তার সঠিক ও ভিত্তিগত স্থান দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাই যা শান্তির পথ রচনা করবে।

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

এমডিজি বিষয়ক আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা

রতনপুর আবদুলস্নাহ হাইস্কুল, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৩ জানুয়ারি ২০১০

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র গত ২৩ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাস্থ নবীনগর থানার রতনপুর আবদুলস্নাহ হাইস্কুলে এমডিজি বিষয়ে এক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে স্কুলের ১০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কুইজ প্রতিযোগিতা শেষে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। স্কুলের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভাপতি কাজী আবিদুর রেজা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, নবীনগর থানা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দারুল ইসহান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক। অনুষ্ঠানে কুইজ বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন কাজী আলী রেজা

আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

তথ্য স্বাক্ষরতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২৩-২৪ জানুয়ারি ২০১০

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে গত ২৩-২৪ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাস্থ নবীনগর থানার রতনপুর আবদুল্লাহ হাইস্কুলে দুদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ৩০ জন ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। ওই স্কুলের ম্যানেজিং বোর্ডের সভাপতি কাজী আবিদুর রেজা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এবং এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের রিসোর্স পারসনের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মেজবাহউল ইসলাম, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য-বিজ্ঞান বিভাগের ফ্যাকালটি মিনহাজউদ্দিন আহমেদ ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সম্যক ধারণা দেয়া। প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তথ্য স্বাক্ষরতা বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন ড. মেজবাহউল ইসলাম

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক ও প্রশিক্ষকবৃন্দের গ্রুপ ছবি

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (বিডিএফ) মেলায় জাতিসংঘ স্টল

১৫–১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বিডিএফ সম্মেলন উপলক্ষে দুদিনব্যাপী এক প্রদর্শনী মেলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘ সংস্থাগুলো এই মেলায় অংশগ্রহণ করে কার্যক্রম তুলে ধরে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এই মেলায় বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী জাতিসংঘ স্টল পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেলাটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীসহ জাতিসংঘ স্টলটি পরিদর্শন করছেন

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রেনেটা লক ডেসালিয়েন জাতিসংঘ স্টলটির কার্যক্রম দেখছেন

জাতিসংঘ রিপোর্ট বিশ্ব সামাজিক অবস্থা : গোলটেবিল বৈঠক

২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত জাতিসংঘ রিপোর্ট–বিশ্ব সামাজিক অবস্থার ওপর গত ২ ফেব্রুয়ারি আইডিবি ভবনে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। জাতিসংঘ সদর দপ্তরের উধর্ষ্তন অর্থনীতিবিষয়ক কর্মকর্তা আনিস চৌধুরী রিপোর্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেন এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ রিপোর্টটি সম্পর্কে মূল বক্তব্য প্রদান করেন। গোলটেবিল বৈঠকটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। বৈঠকে আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বরণ্য অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২১ ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পটভূমি

পরিচিতি, যোগাযোগ, সামাজিক সমন্বয়, শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জটিল সংশ্লিষ্টতার কারণে মানুষ ও গ্রহের জন্য ভাষা কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে। তবু বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার দরুন ভাষা ক্রমবর্ধমান হুমকির মধ্যে রয়েছে, কিংবা একেবারেই হারিয়ে যাচ্ছে। ভাষা বিলুপ্ত হতে থাকলে বিশ্বের সমৃদ্ধ বর্ণিল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও হারিয়ে যেতে থাকে। সুযোগ, ঐতিহ্য, স্মৃতি, চিন্তা ও প্রকাশের অনবদ্য ধরন হলো উন্নততর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার মূল্যবান সম্পদ– যে সম্পদও হারিয়ে যায়।

বিশ্বে কথা বলার জন্য ব্যবহৃত প্রায় ৭ হাজার ভাষার শতকরা ৫০ ভাগের বেশি কয়েক প্রজন্মের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে, আর এসব ভাষার শতকরা ৯৬ ভাগ বিশ্বের শতকরা মাত্র ৪ ভাগ মানুষ কথা বলায় ব্যবহার করে। মাত্র কয়েকশ' ভাষাকে শিক্ষাব্যবস্থা ও সরকারি মহলে যথাযথভাবেই গৌরবজনক স্থান দেয়া হয়েছে, আর একশ'র কম ভাষা ডিজিটাল জগতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইউনেস্কোর কাজের মূল হলো সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপ, সবার জন্য শিক্ষা এগিয়ে নেয়া ও জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজের বিকাশ। কিন্তু বিপন্ন ভাষাগুলো সংরক্ষণসহ বহু ভাষাবাদ ও ভাষাবৈচিত্র্য এগিয়ে নেয়ার প্রতি ব্যাপক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

১৯৯৯ সালের নভেম্বরে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাবাদ এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে।

ভাষা সংশ্লিষ্ট সব খাত ও পরিসেবার মধ্যে যৌথক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে ইউনেস্কো একটি কৌশলগত পরিবীক্ষণ সংস্থা (মহাপরিচালককে সভাপতি করে ভাষা ও বহু ভাষাবাদ বিষয়ক টাস্কফোর্স) এবং একটি পরিচালন পরিবীক্ষণ কাঠামো (ভাষার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোর সমন্বয়ে নেটওয়ার্ক গঠন) গঠন করে।

সুচিন্তিত সমন্বয়, জোরদার ও পুনরুজ্জীবিত কার্যক্রমের লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভাষা ও বহু ভাষাবাদভিত্তিক একটি আন্তঃখাতভিত্তি প্লাটফর্ম (পিএলএম) গঠন করে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভাষা ও বহু ভাষাবাদ সম্পর্কিত মান নির্ধারণী হাতিয়ারগুলোতে বর্ণিত বা তা থেকে গৃহীত নীতিমালা এগিয়ে নেয়া এবং স্থানীয়ভাবে মধ্যমেয়াদি কর্মকৌশলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় ও আঞ্চলিক নীতিমালা গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে।

২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার ৩৩তম সাধারণ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ১৬ মে ২০০৮ সালের আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ ঘোষণা করে এবং ইউনেস্কোকে বর্ষ পালনে নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করে।

এই উদ্যোগ ভাষা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেবল সচেতনতাই বৃদ্ধি করেনি, অধিকন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ভাষাবৈচিত্র্য ও বহু ভাষাবাদের পক্ষে কর্মকৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়নের সমর্থনে অংশীদার ও সম্পদেরও ব্যবস্থা করে।

আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ এমন এক সময়ে আসে যখন ভাষাবৈচিত্র্য ক্রমবর্ধমান হুমকিতে পড়ে। সব ধরনের যোগাযোগের জন্য ভাষা হলো মূলভিত্তি আর মানব সমাজে পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভব করে যোগাযোগ। ব্যবহারে থেকে বা না থেকে কোনো কোনো ভাষা বিশ্বের অনেক স্থানে সমাজের বিরাট অংশের জন্য আজ একটি দ্বার উন্মোচন বা বন্ধ করে দিতে পারে। ইতোমধ্যে উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপ নিশ্চিত করতে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা রয়েছে; কিন্তু সহযোগিতা জোরদার ও সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জন, সামুদায়িক জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজ গঠন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষা এবং স্থিতিশীল উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল প্রয়োগে রাজনৈতিক সদিচ্ছা জাগাতেও ভাষার সমান ভূমিকা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন বর্ষ

পটভূমি

১. ভূমিকা : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১০ সালকে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কোকে বর্ষ পালনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দিয়েছে। মানুষের পারস্পরিক জ্ঞান ও অনুধাবনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ৬০ বছরের বেশি সময়ের অমূল্য অভিজ্ঞতায় এই সংস্থা সমৃদ্ধ। ইউনেস্কোর ম্যান্ডেটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই আন্তর্জাতিক বর্ষ বিশ্বের শিশুদের জন্য শান্তি ও অহিংসা চর্চা বিষয়ক আন্তর্জাতিক দশকের (২০০১-২০১০) সমাপনী এবং নতুন এক কর্মকৌশলের সূচনা পর্বে পালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের পরিবর্তিত অবস্থায় ইউনেস্কো এই প্রতিপাদ্যের ওপর বর্ধিত গুরুত্ব দিচ্ছে যা তার ২০০৮-২০১৩ সালের মধ্যমেয়াদি কর্মকৌশলের লক্ষ্যগুলোর পুরোভাগে রয়েছে। তা হলো 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও এর অনুসিদ্ধান্তগুলো লালন এবং সংলাপ চালানো যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক বিষয়ের অন্যতম এবং সংস্থার তুলনামূলক সুবিধার মূল বিষয় অর্থাৎ বিশ্বের সংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্য এবং সেগুলোকে একত্র করার যোগসূত্রগুলোকে স্বীকার করা।

২. লক্ষ্যগুলো : বর্ষের মূল লক্ষ্য হবে মানবজাতির উষালগ্ন থেকে সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে নিরন্তর স্থানান্তর ও বিনিময় এবং এসব সংস্কৃতির মধ্যে গভীর বন্ধনের গুরুত্ব স্বীকার করে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সুবিধা তুলে ধরা। সংস্কৃতিতে কেবল কলা ও মানবতাই নয় বরং জীবনধারা, একসঙ্গে থাকার বিভিন্ন উপায়, মূল্যবোধ ব্যবস্থা, ঐতিহ্য ও বিশ্বাস, সেগুলো সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য রক্ষা করা ও এগিয়ে নেয়াও অন্তর্ভুক্ত আছে বলে তা আমাদের প্রতি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আহক্ষান জানায়। এর মধ্যে থাকবে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব, মূল্যবোধ ও গতানুগতিকতায় ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের আশায় সব নীতি, বিশেষ করে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ নীতিতে সংলাপ এবং পারস্পরিক জ্ঞানের নীতিমালা সমন্বিত করা।

৩. কর্মকৌশল : সংস্কৃতির সমমর্যাদা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্থায়ী শান্তির জন্য সহযোগিতা জোরদারের অপরিহার্য নীতি গ্রহণ করার ওপর বর্ষের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সদস্য দেশ ও সহযোগী সংস্থাগুলোর আলোচনাকালে ইউনেস্কোর কার্যক্রমের পথনির্দেশনা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। চারটি বড় ধরনের প্রতিপাদ্য চিহ্নিত করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় :

- সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য সম্পর্কিত পারস্পরিক জ্ঞানের প্রসার ঘটানো;
- অভিন্ন লালিত মূল্যবোধের একটি কাঠামো গড়ে তোলা;
- মানসম্মত শিক্ষা জোরদার এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগ্যতা গড়ে তোলা;
- স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সংলাপ লালন করা।

৪. বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রায় ৩শ'র মতো সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ইতোমধ্যেই সদস্য দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সহযোগী এবং ইউনেস্কো সচিবালয় বিবেচনা করছে। সবগুলো উত্তর পাওয়া

গেছে এবং ২০১০ সালব্যাপী পেশকৃত প্রস্তাবগুলো আলোচনার জন্য ইউনেস্কো ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে :

- গবেষণা, সভা-সমাবেশ ও মুক্ত আলোচনার বৃহত্তর সুযোগ, সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে বিনিময় ও স্থানান্তরের বিষয় তুলে ধরে প্রদর্শনীর আকারে আন্তঃসাংস্কৃতিক মধ্যস্থতার সুযোগ বৃদ্ধি, বিশেষ করে জাদুঘর, চিত্রশালা ও ফাউন্ডেশনের মতো স্থান ব্যবহার করে মেলা ও উৎসবের আয়োজন এবং ভাষাবৈচিত্র্য ও ভাষান্তর লালন করে এমন নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা।
- সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সাদৃশ্যগুলোর ওপর জোর দিয়ে উদ্ভাবনের মৌলিক উৎস সৃজনশীলতার ভূমিকা বৃদ্ধি করা এবং এই ক্ষেত্রে ইতিহাস ও পরিচয়ের বাহক হিসেবে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সব বিষয় সম্পর্কে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা ও সংরক্ষণ করা, যা স্থিতিশীল উন্নয়নের একটি সম্পদ ও চালিকাশক্তি এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপসহ আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপের হাতিয়ার;
- সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা, মানবাধিকার, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, লিঙ্গ ও প্রান্তজনের অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং বিশেষ করে উৎকর্ষসাধন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং উত্তর-দক্ষিণ-দক্ষিণ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা জোরদার করা;
- অন্যান্যের মধ্যে অগণিত সংস্কৃতি ও ভাষার বহিঃপ্রকাশ প্রচার ও বিনিময়ের সুবিধা সংবলিত ইন্টারনেট সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের ধারণা পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচারমাধ্যম এবং নতুন নতুন যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির অবদান রাখা অথবা বিশেষ করে স্পর্শকাতর বিষয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রচার মাধ্যমের পেশাজীবীদের মধ্যে সংলাপ লালন করার মতো যৌথ প্রযোজনার ব্যবস্থা করা;
- সনাতন জ্ঞান ও আদিবাসী জনগণের জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধার স্বীকৃতি-যা স্থিতিশীল উন্নয়নের অবদান রাখে। জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্যবিরোধী লড়াই এবং শান্তি ও গণতন্ত্র চর্চার ওপর জোর দিয়ে মানবাধিকার, দর্শন ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপ এগিয়ে নেয়।

৫. অংশীদার : বর্ষের ব্যাপক দৃশ্যমানতা এবং স্থানীয় জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর সর্বাধিক অভিঘাত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোতে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনার, জাতিসংঘ ব্যবস্থার সংস্থাগুলো, আন্তঃসরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো, শুভেচ্ছা দূত ও শান্তি শিল্পী, ইউনেস্কো চেয়ার ও সহযোগী স্কুল, ক্লাব, শিক্ষা ও প্রচারমাধ্যম জগৎ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও অন্য মতের নেতা এবং যুব সংগঠনসহ ইউনেস্কো তার অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করবে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক নীতি-কৌশলের ব্যাপারে দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রয়োজন

১৯৯৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কিয়োটো সম্মেলনে যোগদানের পর থেকে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনায় যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে আমি মুগ্ধ। জলবায়ুর পরিবর্তন যেভাবে ভূপ্রকৃতিকে আক্ষরিক অর্থেই পুনর্বিন্যস্ত করতে পারে তেমনটি খুব অল্প শক্তির পক্ষেই করা সম্ভব। জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাতে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে তার কয়েকটি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, হিমবাহের গলন, হ্রদ শুকিয়ে যাওয়া ও বৃষ্টিপ্রধান ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের বৃক্ষহীন ভূমিতে পরিণত হওয়া।

নাটকীয় পরিবর্তনগুলো ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হয়ে উঠলেও তার প্রভাব ক্রমবর্ধমান হারে আরো মারাত্মক হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব যে কেবল পরিবেশের ওপরই পড়ছে তা নয়, বরং তার এমন গুরুতর সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমনকি নিরাপত্তা অভিঘাতও রয়েছে যা তাকে এক সর্বব্যাপী হুমকিতে পরিণত করছে।

সৌভাগ্যের কথা হলো, জলবায়ু পরিবর্তন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক এজেন্ডায় আবার উঠে এসেছে। দশ বছর আগে কিয়োটো সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ঠিক সে সময়ের মতোই আরো অনেক বেশি লোক, অনেক বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অনেক বেশি স্থানীয় ও জাতীয় সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে একটা অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয় বলে স্বীকার করছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্রচারমাধ্যমও রিপোর্টিং জোরদার করেছে এবং সম্প্রতি প্রকাশিত আইপিসিসি রিপোর্টগুলো সর্বশেষ পাঁচ বছর আগেকার আইপিসিসির নিরূপণের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি মুন জলবায়ু পরিবর্তনকে তাঁর প্রধান অগ্রাধিকারগুলোর অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, ২০১২ সালে কিয়োটো প্রটোকলের প্রথম অঙ্গীকারের মেয়াদ সমাপন এবং একটি ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার মধ্যে কোনো শূন্যতা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য ২০১০ সালের মধ্যে একটি শক্তিশালী কাঠামোর ব্যাপারে দেশগুলোর একটি মতৈক্যে উপনীত হওয়া জরুরি। সমস্যা হলো, কোনো মতৈক্যে পৌঁছানোর আগে বিপুলসংখ্যক প্রতিবন্ধকতা

অতিক্রম করতে হবে। যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, সেই গ্যাস বাড়ছে, কমছে না এবং অনেক দেশ আভাস দিয়েছে যে, প্রত্যেকেই একই ধরনের প্রচেষ্টা চালাবে এমন নিশ্চয়তা ব্যতীত তারা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়।

তবে অবিশ্বাসের অন্যান্য কারণও রয়েছে : উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিবাসী যে ১২০ কোটি লোক দিনে একডলার বা তার কম আয়ে জীবনধারণ করে, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক অতি সামান্য। এমন অনেকে আছেন যারা প্রশ্ন করেন যে, 'তাহলে শিল্পোন্নত দেশগুলো যখন আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে জীবনযাপন করে তখন দরিদ্র দেশগুলো কেন তাদের উন্নয়ন প্রয়াসে সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকবে?' এই প্রশ্ন নতুন নয় এবং মৌলিকভাবে এ প্রশ্নের নিরসন ঘটানো হয়েছে ১৯৯২ সালে রিওডি জেনিরোর ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলনে, যেখানে বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে স্থিতিশীল উন্নয়নের নীলনকশা 'এজেন্ডা ২১'। সদস্য দেশগুলো স্বীকার করেছে যে, সব দেশ ও মানুষের উন্নয়নের অধিকার রয়েছে। তবে সেই উন্নয়নে সন্নিবেশিত হতে হবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশজনিত উদ্বেগের একটি ভারসাম্য। একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য যে সম্পদ ও প্রযুক্তির প্রয়োজন উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তা দিয়ে সহায়তা করতে হবে। আইপিসিসি আমাদের দেখিয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা কার্যকরভাবে নিরসনের জন্য যেসব সমাধান রয়েছে সেগুলো অর্থনৈতিকভাবে নিবৃত্তিমূলক নয়। তবে এসব সমাধান বাস্তবায়নে নিয়োজিত হওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন সব দেশের সম্মিলিত সদিচ্ছার।

সক্রিয় হতে অনেক দেরি বা তা ব্যয়বহুল হওয়ার আগে লোকজনের মধ্যে আমাদের আস্থা গড়ে তুলতে হবে। নিষ্ক্রিয়তার মূল্য সক্রিয়তার মূল্যকে অনেক ছাড়িয়ে যায়। আমরা কী করি বা না করি, তা কোনো ব্যাপার নয়, পৃথিবীর তাপমাত্রা আগামী বছরগুলোতে বাড়তে থাকবে। আইপিসিসি পূর্বাভাস দিয়েছে যে, গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি থেকে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সবচেয়ে ভালো হিসেবে ২১০০ সালের মধ্যে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৫.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট হতে পারে। ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যত বেশি আমরা অপেক্ষা করবো ততো বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস জমতে থাকবে এবং ফল হবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির উচ্চ হার। আইপিসিসির রিপোর্ট অনুযায়ী, অপরদিকে এখনই জোরেশোরে কাজে লেগে পড়লে জলবায়ু পরিবর্তন হারকে আমরা আরো বেশি নিয়ন্ত্রণযোগ্য পর্যায়ে সীমিত করতে পারবো।

২০০৭ সালের ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি বিশ্বের একটা দীর্ঘমেয়াদি সাড়া গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বালি সেই স্থান, যেখানে দেশগুলো এমন একটি বিশ্ব কৌশল নিয়ে আলোচনা করে যা প্রত্যেকে তা অনুমোদন ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। তবে বালিতে পৌঁছানোর আগে সমস্যার প্রাসঙ্গিক বিষয়কে একত্র করার পক্ষে সহায়ক কিছু দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা গড়ে তোলা হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে আমাদের স্বীকার করা দরকার যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোকে নির্গমন হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে স্বল্পমাত্রায় নির্গমনভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল অনুসরণে নিয়োজিত হতে হবে। এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর নির্গমন সীমিত করতে উৎসাহমূলক ব্যবস্থার সুবিধা এবং খাপ খাওয়ানোর জন্য সহায়তা পেতে হবে। একটি শক্তিশালী কার্বন বাজারের মাধ্যমে এর সবগুলোকে একত্রে গ্রথিত করতে হবে। এই কার্বন বাজারের নির্গমন হ্রাসের ব্যয় কমানো এবং তহবিল গড়ে তোলার সুবিধা রয়েছে।

জোরালো সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, ত্বরান্বিত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান নবায়নযোগ্য প্রযুক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় করে তুললে তা গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাসে বিরাট ভূমিকা পালন করবে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ২০৩০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি অবকাঠামোতে ২০ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে। এখন আরো

পরিষ্কার ও অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি শেষ পর্যন্ত জীবন ও অর্থ বাঁচাতে পারে।

আইপিসিসি রিপোর্টের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে অনুধাবন, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো সম্মেলন ও কিয়োটো প্রটোকলের মতো বিশ্ব চুক্তিগুলোকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নেয়ার মতো একটি ফোরামের ব্যবস্থা করা এবং পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন ব্যবস্থা ও কার্বন কেনাবেচার বাজারের মতো নতুন এবং নবাবিষ্কারমূলক ধারণা ও সাড়া গ্রহণের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ ভূমিকা পালন করবে। জাতিসংঘ ব্যবস্থা তার উন্নয়ন এগিয়ে নেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে এই নিশ্চয়তা বিধানে কাজ করছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিলে দারিদ্র্য মোচন কর্মসূচির ওপর তার বিরূপ প্রভাব তো পড়বেই না বরং এই প্রচেষ্টাকে তা জোরদার করবে।

বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার পথ বাতলানো এক বিষয় এবং যথাস্থানে সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ তার নিজের কার্যক্রমকে আরো জলবায়ুবান্ধব করার জন্য একটি নতুন পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সংস্থা ৫৫ বছরের পুরনো সদর দফতরের জীর্ণ-সংস্কার পরিকল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে এই উদ্দেশ্যে যে, জ্বালানি সাশ্রয়, পানি সংরক্ষণ ও বর্জ্য পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণ ব্যবস্থার পাশাপাশি জ্বালানির বর্তমান ব্যবহার শতকরা ৩০ ভাগের বেশি কমানো যায় কিনা। জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকার বা সংস্থার চেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে আপনার ও আমার মতো ব্যক্তির নিজ নিজ জীবনে এই সমস্যা মোকাবিলা করা যাতে, এখন এবং ভবিষ্যতে সব মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয়কর পরিণতি পরিহার করতে পারে।

ক্ষুধার একটি সমাধান কি জৈব প্রযুক্তি?

বিশ্ব ক্ষুধা ও খাদ্য অনিরাপত্তা উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ এলাকার একটি পৌনঃপুনিক সমস্যা। প্রাপ্ত অনেক সম্ভাব্য জৈবপ্রযুক্তি এবং সেগুলো প্রয়োগের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে শস্যের জিনেটিক পরিবর্তন (জিএম) বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। বিভিন্ন প্রজাতির জিন সংবলিত জেনেটিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত শস্য সম্ভবত বিশ্বের খাদ্য ঘাটতি দূর করতে পারে। জেনেটিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত শস্য কৃষকদের বড় ও ভালো ফলন দিতে পারে বলে প্রাথমিক পর্যায়ে উৎসাহ-উত্তেজনা থাকলেও এ ধরনের শস্যের সুফল নিয়ে এখনো প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়া বিশ্বক্ষুধা সমস্যা নিরসনের সম্ভাব্য পছন্দ হিসেবে জনসাধারণ হয়তো 'চমকপ্রদ উদ্ভিদ' সৃষ্টিকে স্বাগত জানাবে না।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে জিনেটিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত শস্যের পরিবেশগত অভিঘাত গুরুত্বপূর্ণ। জিনেটিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত শস্য অঙ্কুরোদ্গমে ব্যর্থ হতে পারে; কীট ব্যতীত শস্যের জন্য উপকারী অন্যান্য পোকামাকড় মেরে ফেলতে পারে ও মাটির উর্বরতা হ্রাস করতে পারে এবং কীটনাশকের স্বভাবধর্ম ও ভাইরাস-প্রতিরোধ ক্ষমতা শস্য প্রজাতির বুনো স্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে।

বিজ্ঞানী সমাজের একটা অংশ প্রায়ই প্রস্তাব করে যে, উচ্চতর কৃষি ফলন থেকে প্রাপ্ত রফতানি আয় উন্নয়নশীল বিশ্বের খাদ্য অনিরাপত্তা ও ক্ষুধা হ্রাসে অবদান রাখতে পারে। অবশ্য এই প্রস্তাবের প্রায়োগিক দিকের যৌক্তিকতা মেনে নেয়ার ব্যাপারে অনেক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশেষভাবে সৃষ্ট গুটি কয়েক ধরনের শস্যের ফলন বাড়াতে পারে; কিন্তু এককভাবে জৈবপ্রযুক্তি উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষুধা সমস্যার সমাধান দিতে পারে না।তবে কৃষি প্রয়োগের ব্যাপক ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি সম্ভাব্য সুবিধা দিতে পারে,

আর ক্ষেত্রগুলো হলো গবাদিপশু ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্য ভান্ডারজাতকরণ ও চলতি শস্য উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা। এছাড়া এতে সার, লতাগুল্মনাশক ও কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পায়। প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো জৈব প্রযুক্তিগত সমাধানের সুবিধা ব্যবহারে আমরা যথেষ্ট চৌকশ কিনা। এসবের সমাধান কী?

জৈবপ্রযুক্তিতে সংশ্লেষী খাদ্যের একটা সম্ভাবনাময় বিকল্প এবং প্রচলিত উদ্ভিদ প্রজনন প্রযুক্তি উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে মিলে এটা ভোক্তার স্থিতিশীল কৃষি চাহিদা পূরণের একটি চমকপ্রদ ও পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল উপায় সৃষ্টি করে। জিএম শস্যের সুবিধা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর কাছে পৌঁছালে আরো বেশি সবুজ বিপ্লব বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবিলা

ক্ষুধার ওষুধে অপুষ্টি একটা আপেক্ষিক শব্দ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অতি সাম্প্রতিক হিসেবে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী ৮৫ কোটি ৪০ লাখ লোক অপুষ্টির শিকার। এটা বিশ্বের ৬শ' ৬০ কোটি জনসংখ্যার ১২.৬ শতাংশ। অপুষ্টির শিকার ৮৫ কোটি ৪০ লাখ লোকের মধ্যে সবচেয়ে দৃশ্যমান শিকার হলো উন্নয়নশীল দেশের শিশু। অপুষ্টির কারণে হাম ও ম্যালেরিয়াসহ প্রতিটি রোগের অভিঘাত বেড়ে যায়।

একটি দৃষ্টান্ত আমাদের জানিয়ে দেয় যে, জৈবপ্রযুক্তি কীভাবে বিশ্বের ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবেলায় অবদান রাখতে পারে।

সোনালি ধান

বিশ্বের ১১৮টি দেশ, বিশেষ করে আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বল্প আয়ের গ্রুপে প্রায় ১৪ কোটি শিশুর ভিটামিন-এ ঘাটতি রয়েছে। এই পরিস্থিতি জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ বাড়িয়ে তুলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে জানান হয়েছে যে, ভিটামিন-এ ঘাটতির শিকার ২ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ শিশু প্রতিবছর অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এদের অর্ধেক শিশু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ১২ মাস বয়সের মধ্যে মারা যাচ্ছে। জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের সৃষ্ট সোনালি ধানে তিনটি নতুন জিন রয়েছে, এর দুটি ডেফোডিল থেকে এবং একটি ব্যাকটেরিয়াম থেকে সংগৃহীত। এই ধান প্রোভিটামিন-এ তৈরিতে সহায়তা করে। আংশিকভাবে জৈব প্রযুক্তি কোম্পানি কর্তৃক রোগীর অধিকার পরিত্যাগ করে গণবিতরণের জন্য সম্ভাব্য পছন্দ হিসেবে এই ধান পাওয়া যায়। শত শত নতুন জৈবজাত পণ্যের মধ্যে এটি মাত্র একটি, যা সমাজে জৈব প্রযুক্তির অবদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মেধাসম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা

প্রায় একান্তভাবে বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রিত ও পেটেন্ট করে সংরক্ষিত বলে বর্ণিত প্রযুক্তি জগৎ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। পেটেন্টের মাধ্যমে বৃহদায়তন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্ভিদের জিনের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যায়, যার কিছু উৎকণ্ঠাকর অভিঘাত রয়েছে। ফসল আবাদের প্রতিটি মৌসুমে কৃষককে বীজ কিনতে হলে তাদের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিরূপ প্রভাব পড়ে। যদিও মনসানটো ও এসট্রাজেনেকার মতো জৈবপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলো ঘোষণা দিয়েছে যে, তথাকথিত 'সমাপন' বা জীবনিষ্ফলাকরণ প্রযুক্তি তারা বাণিজ্যভিত্তিক করবে না। এই প্রযুক্তির জিনেটিক উদ্দেশ্য হলো একটি উদ্ভিদের দ্বিতীয়বারের মতো অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা বন্ধ করে দেয়া। জৈবপ্রযুক্তি শিল্পের এখতিয়ারে সম্মিলিতভাবে অন্তত তিন ডজন পেটেন্ট রয়েছে যা হয় বীজের অঙ্কুরোদগম বা অপরিহার্য উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। একটি উদ্ভিদের জেনেটিক সম্পদের বেসরকারিকরণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি গবেষণার জন্য কেবল অসুবিধাই সৃষ্টি করে না, অধিকন্তু আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র চাষীর জীবিকার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে। কেননা তারা একটি ফসলের জীব পরবর্তী পর্যায়ে আবাদের জন্য রেখে দেয়ার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জৈব প্রযুক্তিজাত পণ্য বা সেগুলো উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রক্রিয়ার ওপর মেধাসম্পদ অধিকারের (আইপিআর) একটা সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। আইপিআর যে কেবল বেসরকারি কোম্পানিগুলোরই রয়েছে তা নয় বরং কোনো কোনো সরকারি সংস্থারও এ অধিকার রয়েছে। ফলে প্রক্রিয়ার কোনো পর্যায়ে পেটেন্ট লঙ্ঘন না করে বড় ধরনের শস্য প্রজাতি উন্নয়নে জৈব প্রযুক্তির কোনো কিছু ব্যবহার করা অসম্ভব। মেধাসম্পদ অধিকারের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা স্বার্থ থেকে জৈবপ্রযুক্তির সম্ভাবনাকে সবসময় আলাদা করা সম্ভব নয়। কৃষি জৈবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে আইপিআরের একটা বড় পরিণতি হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেকে যারা এখনো জৈবপ্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করেনি, ভবিষ্যতে তারা হয়তো আর হালে কূল পাবে না।

> কৃষি জৈব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আইপিআরের একটা বড় পরিণতি হলো, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেকে যারা এখনো জৈব প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করেনি, ভবিষ্যতে তারা হয়তো আর হালে কূল পাবে না

সম্ভাবনা

ব্যাপক গবেষণার ভিত্তিতে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জৈব প্রযুক্তির বিজ্ঞানীরা অনেক সময় অত্যন্ত বিশেষায়িত ও কুশলী হয়ে থাকেন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুধা ও খাদ্য নিরাপত্তার জটিল বিষয় দেখতে গিয়ে তাদের অতিরিক্ত যোগ্যতাও থাকতে হয়।

উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য জৈবপ্রযুক্তির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চফলনশীল, রোগ ও কীট প্রতিরোধে সক্ষম শস্য ব্যবহারের একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে উন্নত খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য মোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর। কম জমিতে জিএম শস্যের ফলন বেশি হবে বলে আশা করা যায়। এটা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিজেদের টিকিয়ে রাখা ও বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা হ্রাসের একটা উপায় সৃষ্টি করতে পারে।

বিশ্বের ১ কোটি ৩৩ লাখ 'জৈবপ্রযুক্তি শস্য চাষী'র শতকরা ৯০ ভাগই উন্নয়নশীল দেশের। ১৪টি 'বৃহৎ জৈব প্রযুক্তি শস্যের' আবাদকারী দেশের মধ্যে ৭৬ লাখ হেক্টর জমিতে আবাদ করে ভারতের স্থান চতুর্থ। দৃষ্টান্ত হিসেবে ভারতে ৫০ লাখ কৃষক ৭৬ লাখ হেক্টর জমিতে বিটি বা ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস, তুলা চাষ করছে, যাতে কোনো কীটনাশক ব্যবহার না করলেও পোকামাকড়ের কোনো আক্রমণ হয় না। বিটি তুলা চাষের ফলে শতকরা ৩১ ভাগ উৎপাদন বেড়েছে, কীটনাশকের ব্যবহার কমেছে শতকরা ৩৯ ভাগ এবং প্রতি হেক্টরে ২৫০ ডলারের সমান মুনাফা বেড়েছে।

জৈবপ্রযুক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে একটি উদ্ভিদ থেকে শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত তেল আহরণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিশ্বে হাইড্রোকার্বনের মজুদ ফুরিয়ে গেলে ভবিষ্যতে জৈব ডিজেলের মতো উদ্ভিজ তেল হয়তো-বা তেল, কয়লা ও গ্যাসের সঙ্গে মূল্য ও গুণগত মানে প্রতিযোগিতায় চলে আসবে।

চূড়ান্ত ভাবনা

বিশ্বের খাদ্য সরবরাহ প্রচুর, ঘাটতি নেই। বিশ্বে শস্য ও অন্যান্য খাদ্যের যে পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় তা থেকে প্রতিদিন প্রত্যেক লোককে অন্তত ৪.৩ পাউন্ড করে দেয়া যায়। বিশ্বে ক্ষুধার প্রকৃত কারণ দারিদ্র্য, যার কঠোর কষাঘাতে পড়ে নারী অথচ অনেক পরিবারে এই নারীই পুষ্টির দ্বাররক্ষক। অর্থনীতিবিদদের মতে, ক্ষুধার সমাধান করতে হলে রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন, কেবল কৃষি প্রযুক্তিগত সমাধান নয়। তাদের মতে, এখনো অপ্রমাণিত ও অস্তিত্বহীন উপায় জৈবপ্রযুক্তির দিকে তাকিয়ে না থেকে সিদ্ধান্ত প্রণেতারা পূর্ণাঙ্গ গবেষণার দিকে নজর দিলে দেখতে পাবেন যে, ক্ষুধা বিদূরণে সমাধানের প্রকৃতি প্রযুক্তিগত নয়, বরং তার মূল আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় নিহিত রয়েছে। এ কথা বলা হচ্ছে না যে, ধরা যাক, অপুষ্টি বিদূরণে জৈবপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি কোনো ভূমিকা পালন করে না, কিন্তু যে আশু রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি মানুষকে দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত করে রাখে তাকে কোনো প্রযুক্তি ডিঙিয়ে যেতে পারে না। বিশ্বের জৈব প্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সীমিত মাত্রার পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত, যার বিরাট ও নিরাপদ বাজার রয়েছে প্রথম বিশ্বে-বিশ্বের ক্ষুধার্তদের প্রয়োজনের সঙ্গে এসব পণ্যের সম্পর্ক অতি সামান্য।

জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ বিশ্বের ক্ষুধা সমস্যার উল্লেখযোগ্য সমাধান করতে পারে। সবুজ হলো কৃষি জৈবপ্রযুক্তি, উর্বরতা, আত্মমর্যাদা ও কল্যাণের রঙ। আমার মতে, নীতিনির্ধারকদের বিশ্বের ক্ষুধা সমস্যা বিদূরণের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে আধুনিক জৈবপ্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্পদকে বিবেচনা করা উচিত।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org